হুইল চেয়ার

হিমাংশু কীর্তনীয়া

দ্বিজপদ নিজেও জানে না, হঠাৎ কেন যে সে, ছাবিবশে আগষ্ট নিরানববই, বুধবার, একদম ভর সন্ধ্যাবেলায়, যখন, যে সব বাড়ীতে আজও মহিলারা সন্ধ্যায়, ধুপদীপ দেখান, শঙ্খ বাজান এবং লক্ষ্মীর পাঁচালী সুর করে পড়েন, যদিও এমন বাড়ীর সংখ্যা গ্রামেও আজকাল কম, শহরে শূন্যে ঠেকেছে, তথাপি দ্বিজপদ অফিস ফেরৎ যেন শঙ্খের শব্দে সমুদ্র ছুঁয়ে ফেলেছে, সমুদ্রের নোনা জলে সাঁতার কাটছে, বালি ভাঙছে, ভাঙতে ভাঙতে পাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে নীল সাগরের বুকে শঙ্খ চিলের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে নিজের শহরতলীর বাড়ীর দরোজায় এসে দাঁড়ালো। যে দরোজা দিয়ে সাধারণত অতিথিরা আসেন, দ্বিজপদই ছোট্ট বাড়ীটা তৈরী করার সময় ওই গেটের সামনে সব মহলবাড়ীর কায়দায় একটা সংগীতমুখর কলিংবেল লাগিয়েছিল, যা সে লাগানোর দিন পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকবার বাজিয়েছিল এবং পরে আর বাজানোর বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, কারণ দ্বিজপদর বরাবরের অভ্যাস, বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের ছোট গেট দিয়ে, বাগানের মুখে নানান গাছ, কিছু ফুল ও ফলের গাছ লাগিয়ে সুন্দর একটি শান্তিনিকেতনী ছন্দ আনার চেষ্টা করেছে। বাড়ীতে ফিরে সেই বাগানের ভেতর দিয়ে সরাসরি পথ ধরে ভেতরে বাড়ীর দরোজায় যেতে যেতে বাগানটা দেখতে দেখতে ঢোকার অভ্যেস দ্বিজপদর। বটের এবং নিমের বনসাই আছে, অরকেরিয়া, ফরকেরিয়া, সাইকাস, বাহারী নাম এবং দেখতে সত্যিই অপরূপা এই সব দলাপাকানো সবুজের ঢিবির মত ছোটবড়ো গাছগুলো। দ্বিজপদর অসুখী কোন চিত্রকল্প এই সব আঙ্গিকে ধরা পড়েনা, বরং সুখী কবুতরের মত গন্ধওড়ে।

দ্বিজপদর বাড়ীর কলিংবেল মাঝে মাঝেই বেজে উঠে। প্রতিবেশী কেউ আসেন। নতুন দু'একজন দূরের মানুষও আসেন এবং তারা বেল বাজান। বেল বাজানোর শব্দের মধ্যে বেশ একটা মনোরম আগমনী সুবাস পাওয়া যায়। কু-বাসও যে আসে না তাও ঠিক নয়। হঠাৎ কোন দিন এমন কেউ বেল বাজালেন, দরোজা খুলে তাকে দেখে ঠিক আলোকিত হওয়া যায় না। তথাপি দরোজা খুলে সেই অপ্রিয় খামের লোকটিকে ভেতরে আসতে বলতে হয়, বসতে বলতে হয়, এবং কথা বলতে হয়, মুখে হাসি ঝুলিয়েও রাখতে হয়, হয়তোবা। আজ সন্ধ্যার সময় গেটের কলিংবেল বাজতে শুনেই দ্বিজপদর মেয়ে শানু, আঠারোতে পা দিলো এই সেদিন, ছোটখাটো দেখতে, স্বাভাবিক চটুলতার বিপরীত চিহ্নবাহী পদক্ষেপ, চলমানতা এবং দরোজা খোলার ব্যঞ্জনায় একটু অন্যরকম শানু, প্রথমে বারান্দার আলো জ্বেলে, তারপর চাবি দিয়ে দরোজা খুলে, একেবারে হতবাক, 'বাবা! তুমি?'

'হ্যাঁরে আমি, আমি কি বেল বাজাতে পারি না?'

'না, তা নয়, তোমার বেল বাজানোটা একেবারে অন্যরকম, কখনো শুনিনি কিনা। পেছনে কি?'

'তাইতো পিছনে কি? ওটা একটা চেয়ার রে!'

'চেয়ার? ওরকম রিকশা-ভ্যানের মতো দেখতে?'

'হ্যাঁ, ওটাকে হুইল চেয়ার বলে।'

'হুইল চেয়ার কেন? কার জন্য?'

'আচ্ছা দরোজা ছেড়ে সরে দাঁড়া। বারান্দায় তুলতে দে তারপর বলছি সব।'

বারান্দার আলো থেকে কিছু আলোর ভ্রূণ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে হুইল চেয়ারের সাদা নিকেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

বসার গদিটা লাল ফোম লেদারের। ভেতরে স্পঞ্জ থাকাতে পেটটা উঁচু গর্ভবতী মেয়েদের পেটের মত লাগছে। দুধরঙের সেলোফিন পেপারে মোড়া। পেছনের হেলান দেওয়ার গদিও লাল। ফিকে আলোয় লালের গভীরতা কালচে দেখায় প্রথম। কেউ যদি পেছনে দাঁড়িয়ে হুইল চেয়ারটাকে আরোহীসহ এগিয়ে নিতে চায়, যে হ্যান্ডেলদুটি ধরতে হবে তার 'সু' কুচকুচে কালো। আরোহীর পা রাখার যায়গায় এ্যালুমিনিয়ামের বরফি কাটা প্লেট লাগানো। ভারী সুন্দর দেখতে চেয়ারখানা। দ্বিজপদ পেছনের হাতল ধরে বারান্দায় তুলল। কোন পয়সাওয়ালা লোকের অথর্ব শরীরটা যেন বারান্দায় উঠে এলো হামাগুড়ি দিয়ে। এটা শানুর চোখের দৃষ্টিতে প্রথমেই কেমন যেন বিসদৃশ্যভাবে ফুটে উঠলো।

দ্বিজপদ শানুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ম্রিয়মান হাসি এবং ঈষৎ হলুদ বর্ণের কাশি একসঙ্গে মিশিয়ে একবার শানুর দিকে আর একবার

চেয়ার খানার দিকে তাকালো। দ্বিজপদর নামটা একটু প্রাচীন, মেঠো টাইপের । অথচ তার আটোসাটো শরীরের সঙ্গে নামের সঙ্গ তি নেই কোন। এমনকি তার স্ত্রীর নামের সঙ্গেও বটের ঝুরির মত স্বাভাবিক গ্রাম্যতা আছে। যেমন স্বর্ণপ্রভা, দ্বিজপদর বৌয়ের নাম। সন্ধ্যার মুখে কলিংবেল বাজানো শুনে, শানু ফিরছে না কেন দেখতে, কার সঙ্গে এতক্ষণ বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখতে, স্বর্ণপ্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো। অতএব স্বর্ণপ্রভাকে হতচকিত হতে হয়। প্রথমত দ্বিজপদ কলিংবেল বাজিয়েছে এজন্য, দ্বিতীয়ত শানুর চোখের দৃষ্টিতে বৃষ্টিভেজা দিনের শুকনো ঠাঁই খোঁজার লাল পিঁপড়ের সারি দেখে, তৃতীয়ত দ্বিজপদর বোকাবোকা হাসি এবং কাশির বিষয়বস্তু যে জিনিষটাকে কেন্দ্র করে, হঠাৎ সেটার দিকে নজর পড়তেই স্বর্ণপ্রভার আর্তনাদ, 'হায়! হায়! হুইল চেয়ার কেন? কার জন্য? ' দ্বিজপদ স্বর্ণপ্রভার বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় তার চোখের কালো মণি দুটোর ভেতরের কর্ণিকা ফেটে জলের ঢেউ উঠে আসছে আর মণির চারপাশের সাদা অংশে চাল ধোয়া জলের অস্বচ্ছতায় কাল-বৈশাখীর আঁচ পায়। দ্বিজপদ কোনোরকমে বলে, ' আরে তুমি! শানু সবাই ওরকম করছো কেন? এটা তো একটা হুইল চেয়ার'। স্বর্ণপ্রভা বলতে চাইল আমি কি বলেছি ওটা হুইল চেয়ার নয়। কিন্তু বলতে পারল না। স্বর্ণপ্রভা যেন দেখতে পেল সে, অথবা শানু, কিংবা দ্বিজপদ ওই চেয়ারের মধ্যে গুটিয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের শরীরটা এক একবার লতপতিয়ে চেয়ারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে আসছে এক একজন করে। শেষ যার শরীরটা ঢুকল, সেটা স্বর্ণপ্রভারই সম্ভবত। দ্বিজপদ ঘাবড়ে গিয়ে স্বর্ণপ্রভার কাছে আসে এবং কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়, ' কি হোলো তোমার স্বর্ণ'?

স্বর্ণপ্রভার চোখে শুকনো নীরবতা। হুইল চেয়ারখানার মসৃণ সৌন্দর্য ক্রমশ উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে ফুটে উঠছে। কখনো না কখনো এই সংসারের কোন কংকালের যদি কাজে লাগে একথা ভেবে স্বর্ণপ্রভার চুল ও চোখের ভ্রুতে কাঁপুনি ধরে।

' কিনে আনলে'? স্বর্ণপ্রভা সোনালী সুরে দ্বিজপদকে জিজ্ঞেস করে। ' ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু। যে কোন জিনিষ ফেলনা নয়। কখন কি কাজে লাগে বলা তো যায় না।' স্বর্ণপ্রভা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে এক নিশ্বাসে দ্বিজপদ বলে,'না না স্বর্ণ, এটা কিনিনি। এর একটা ইতিহাস আছে। আমাদের অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের এবছর, দুঃস্থদের জন্য বস্ত্র এবং বই বিতরণের প্রোগ্রাম ছিলো। আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে লায়ন্স ক্লাবও কয়েকটি হুইল চেয়ার বিতরণের জন্য দিয়েছিল। হুইল চেয়ার চেয়ে যারা আবেদন করেছিলো তাদের মধ্যে একজন আসেনি। সম্ভবত মারা গেছে লোকটি। সেই চেয়ারখানাই একটু এদিক ওদিক করে আমি নিয়ে এসেছি। বিক্রী করলেও তো কিছু টাকা আসবে কি বলো স্বর্ণ?' একদমে কথাগুলো বলে দ্বিজপদ খা নিকটা সবল হওয়ার সুযোগ পায়।

স্বর্ণপ্রভা দেখলো হুইল চেয়ারখানায় কে যেন বসে আছে। অসমর্থ শরীর একপাশে হেলে পড়েছে। চেয়ারখানাকে পেছন থেকে কে যেন ঠেলে এগিয়ে নিয়ে আসছে। স্বর্ণপ্রভা ছুটে এগিয়ে যায় চেয়ারখানার দিকে। যেন লোকটা পড়ে না যায়, তাকে ধরে ফেলতে। শ ানু ভেতরে চলে গেছে। তার সম্ভবত পরিবেশটা আর ভালো লাগছিলো না। দ্বিজপদও যেন কাজটা ভালো হয়নি এতক্ষণে বুঝতে প ারলো। আসার সময় অবশ্য মনের মধ্যে একটা দাণ চপলতা খেলা করছিলো। শানু এবং স্বর্ণপ্রভা খুব হাসবে দ্বিজপদর কীর্তি দেখে। খানিকটা রাগ করবে। তবু হাসিতে কম পড়বে না। তারপর দু-চার দিন পরে কাউকে দিয়ে দেবে, অথবা বিক্রী করে দেবে এরকম ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি কেমন চিটে চিটে হয়ে গেল মুহূর্তে।
'হাত মুখ ধুয়ে এসো। চা করছি।' অলস কণ্ঠস্বর স্বর্ণপ্রভার।
দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে কলতলায় যায়।
রাতের খাবার সময় অন্যদিনের তুলনায় শানু বা স্বর্ণপ্রভা ভীষণ নীরব। দ্বিজপদ অস্বস্তি এবং রাগ দুটোকেই হজম করতে গিয়েও না পেরে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।
'তোমরা ভাবছো কি স্বর্ণ? আমি জালিয়াতি করে আনিনি। কিছু ভেবেও আনিনি।'
কিছু বলেছি তোমাকে? জিনিষটাতো ভালো। দাণ সুন্দর।'
'না যা ভাবখানা করছো তোমরা, মনে হচ্ছে বিরাট কোন অন্যায় করে ফেলেছি।'
'তুমি তোমার মতো ভাবছো'।
'তোমরা ভাবাচ্ছো'।
'বাবা ওটা এনে ঠিক করনি। অফিসের ক্লাবেই রেখে আসতে পারতে।'
'ঠিক আছে কাল নিয়ে যাব।'
'থাকনা, এনেছো যখন,' স্বর্ণপ্রভা ডালের বাটি এগিয়ে দিতে দিতে বলে।

আর কোন কথা এগোয় না। দ্বিজপদও গম্ভীর হয়ে যায়। তার শরীরের মধ্যেও স্বর্ণ এবং শানুর পরিত্যক্ত নাইট্রোজেনশ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ দ্বিজপদর ঘুম ভেঙে যায়। আলো জ্বালে। তার মনে হলো স্বর্ণপ্রভা বিছানায় নেই। বাথমে গেল কি? দ্বিজপদ মনে করতে পারে না রাতে বাথমে যেতে গিয়ে স্বর্ণ কোনোদিন একা গেছে। যতরাতেই যেতে হয় দ্বিজপদকে ডেকে তুলে জা গিয়ে রেখে যাবেই। আজ কি হলো স্বর্ণর? বিছানা থেকে নেমে দ্বিজপদ বাথমের কাছে যায়। না বাথম ফাঁকা। ঘরে ফিরে দেখে বার ান্দার দিকের দরোজার ছিটকানি খোলা। দ্বিজপদ তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে আলো জ্বালায়। চেয়ারটার ওপর বসে আছে স্বর্ণপ্রভ া। কেমন বিবর্ণ তার অবয়ব। লালা গড়িয়ে পড়ছে কি মুখ দিয়ে! দৃষ্টি ওরকম অস্বচ্ছ কেন স্বর্ণপ্রভার? ছুটে গিয়ে স্বর্ণকে টেনে তোলে হুইল চেয়ার থেকে। পাঁজা কোলে করে প্রায় অচৈতন্য স্বর্ণকে ধরে নিয়ে যায় ঘরে। শানুকে ডেকে মায়ের পাশে বসতে বলে বারান্দার গেট খুলে দ্বিজপদ হুইল চেয়ারখানা গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। স্বর্ণপ্রভা ছুটে আসে। 'করছো কি? এই রাতের বেলায় তুমি যাবে কোথায়? আসলে আমার ঘুম আসছিল না। তাই ঘুরতে ঘুরতে বারান্দায় এসে চেয়ারটাতে বসেছিলাম। রাখো। ঘরে চলো।

সে রাতে দ্বিজপদর ঘুম হল না। বাকী রাত স্বর্ণপ্রভা দ্বিজপদকে জড়িয়ে শুয়ে থাকল। ফলস্বরূপ রাতের নগ্নতায় দ্বিজপদ এবং স্বর্ণপ্রভ া একসময় বেআব্রু হয়ে পড়ল। স্বর্ণপ্রভার পিঙ্গল শরীরের উচ্ছ্বাস দ্বিজপদর অজানা নয়। আজ কেমন যেন টেনে অনিচ্ছাকৃত ভাবে শরীরে ঢেউ তুলতে গিয়ে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ দ্বিজপদ অনুভব করে। দ্বিজপদও যান্ত্রিকভাবে রাতের শেষ শয্যা থেকে একসময় উঠে পড়ে। স্বর্ণপ্রভা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন রবিবার। অফিস ছুটি। ছুটির দিন দ্বিজপদ সাধারণত বাগানের পরিচর্যা করে। স্বর্ণপ্রভা ভোরে উঠে চা করে। তারপর টিফিন তৈরী করে। দ্বিজপদ চা টিফিন করে বাগানের কাজে হাত লাগায়। শানু টিউটরের কাছে পড়তে যায়। ভোরেই সে বেরিয়ে গেছে। অ াজ স্বর্ণপ্রভার উঠতে দেরী হলো। শানু চা না খেয়েই বেরিয়ে গেছে। দ্বিজপদও ভোরে কোথায় যেন কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেছে। স্বর্ণপ্রভার ঘুম ভাঙল যখন তখন সূর্যের আলো বেশ চড়ে গেছে। ফাঁকা বাড়ি। দ্বিজপদ গেল কোথায়? বাগানে তো নেই। বেলা দশটা নাগাদ দ্বিজপদ ফিরলো। অনেকটা পথ হাঁটার ক্লান্তি ঘাম এবং বিমর্ষ, গর নরম ন্যাদার মত চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

'কোথায় গিয়েছিলে সকালে?'

'এই একটু হেঁটে এলাম।'

শানুও ফেরে এই সময়। সকালের টিফিনে বসে সবাই। পরিবেশ ধীরে ধীরে অনেকটা হালকা হয়ে আসে।

' সেন পাড়ায় গিয়েছিলাম। গিরিনদার স্ট্রোক হয়েছে। অবস্থা ভালো নয়। '

'সে কি? গিরিনবাবু তো তোমাদের বয়সী। কি করে হলো?

'স্ট্রোক কি করে হয় তা তো জানিনা। রাতের খাওয়ার পর শুয়েছিলেন। মাঝরাতে বুকে যন্ত্রণা। বমি বমি পাচ্ছিল নাকি। বাথমে যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন। বামদিকটা অবশ হয়ে গেছে। '

'কবে?'

'দিন দুয়েক হলো।'

'এখন কেমন আছেন?'

'ওষুধ এবং ম্যাসাজ চলছে। বেশ কিছুদিন লাগবে। পুরোপুরি সুস্থ হবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আবার বাতাস ভারী হয়ে গেলো। সুস্থ মানুষগুলোর এরকম হঠাৎ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ভীষণ কষ্টদায়ক।

এখন বাতাসে আর্দ্রতা, গরম অস্বাভাবিক। মাঝে নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই গরমের অত্যাচার এবং বৃষ্টির অনিয়মিত আক্রমণে সব গাছ গাছালিতে সবুজের আধিক্য। এর মধ্যেই দ্বিজপদর বাগানের সাইকাস, দ্বিজপদর প্রিয়তম সজার কাটার মত তীক্ষ্ণপত্রপুঞ্জের গাছটির সবুজের হলুদের ছাপ নজরে পড়লো। পোকায় কয়েকটি পাতা কেটে দিয়েছে। খুরপি দিয়ে গাছটির গোড়ার মাটি আলগা করতে করতে দ্বিজপদ গভীর হতাশা বোধ করে। বেশ কয়েকদিন বাগানটির দিকে নজর না দিতে পারায় এরকম ঘটনা কখন ঘটে গেছে টের পায়নি। দ্বিজপদ খবর নিয়ে জেনেছে এই গাছ আসলে পাথুরে গিট ভেঙে জলের সিঞ্চন ঘটিয়ে বাঁচে। আলগা দোআঁশ মাটিতে তাই জীবন ধারণ করার পক্ষে একটু কষ্টকর। দ্বিজপদ যথাসম্ভব মাটিকে শক্ত করার চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে আবার অ ালগা করে দিতে হয় মাটি। হাওয়া খেলানোর জন্য। গত দিনকয়েক দ্বিজপদ বাগানটির দিকে নজর দিতে পারেনি। কারণ রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে সেও একজন। লায়ন্স ক্লাব তাদের সাথে একযোগে তিনখানা চেয়ার দেবার কথা বলার পর থেকে এবং চেয়ারগুলো তাদের অফিসে আসার পর থেকেই দ্বিজপদর একটা ভাবান্তর হয়েছিল। লাল চেয়ারখানা তাকে ভীষণ অ

াকৃষ্ট করেছিল। লিষ্ট মিলিয়ে দেখেছিল তিনজনের নামের। সজল বাই, হিন্দ মোটরে বাড়ি। ধনেশ চত্রবর্তী, বিশর পাড়া, বিরাটি। তৃতীয় নীলকান্ত ঘরামী, বনমালীপুর, বারাসাত।লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন। তিনিই চেয়ারগুলো দেবেন এই আপায়েজ মানুষগুলোকে। তারা চিঠিপত্র দিয়ে যোগাযোগ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি, নীলকান্ত ঘরামী নামটা দ্বিজপদকে খুব ভাবনায় ফেলেছিলো। মনে হলো তার চেনা। কিন্তু সব মনে করতে না পারায় সে একদিন বারাসতের বনমালীপুর চলে যায়। এবং সে ঠিক বুঝতে পারে তার অনুমানই ঠিক। তাদের অফিসেরই পাশের এক প্রাইভেট ফার্মের বহুদিনের পুরানো কর্মী, প্রায় দশ বছর আগে রিটায়ার করে ছিলেন নীলকান্তবাবু। বাড়ীর কাছে গিয়ে প্যান্ডেল এবং দুটো মাথা মোড়া ছেলেকে দেখে বাকীটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় নি কি হয়েছে।

অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখ, বুধবার যখন এক এক করে নাম ডেকে হুইল চেয়ারগুলো দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে একজন গরহাজির। তিন নম্বর নাম, নীলকান্ত ঘরামীর নাম বারবার ঘোষণার পরও কেউ এগিয়ে না আসায় দ্বিজপদ ভাবলো আসল কথাটা বলে দেয়। বলতে গিয়ে বলার সময় সে বললো উল্টো কথা।

'নীলকান্ত বাবু খুবই অসুস্থ আমার পরিচিত। কাছেই থাকেন। ওটা আমিই নিয়ে গিয়ে দিয়ে দেবো।' লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তাও তাই মেনে নিলেন। কারণ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া আবার হাঙ্গামার ব্যাপার। কথাটা বলার পর থেকেই ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিলো দ্বিজপদর, কিন্তু বলা হয়ে গেছে আর কিছু করার নেই।

পাঁচটা ফরকেরিয়া আছে দ্বিজপদর বাগানে। ফিকে হলুদ আর সবুজ রেখার ফরকেরিয়া গুলো দেখতে এত সুন্দর লাগে, চোখে অনেকটাই তৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু একটা ফরকেরিয়ার মাঝখানের বিশাল পাতাটা ওরকম নুয়ে আছে কেন? কাছে গিয়ে দেখে পাতাটার গোড়া থেকে ভাঙা। পাতা নয় যেন দ্বিজপদর হাতখানা অথবা একখানা পা কেউ ভেঙে দিয়েছে। নীল, বিষাক্ত নীল যন্ত্রণা মনের মধ্যে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে ওঠে। মাথার মধ্যে দপদপ করতে থাকে। চিৎকার করে স্বর্ণপ্রভা এবং শানুকে ডাকতে যায়। কিন্তু ডাকা হয় না। কারণ দ্বিজপদ দেখতে পায় স্বর্ণপ্রভা দরোজা দিয়ে বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। হুইল চেয়ারে বসে নিজে নিজে চালিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দ্বিজপদ হা করে তাকিয়ে থাকে।